৩ হাজারেরও বেশি গাছ কর্তন পাখি ও পরিবেশ হুমকিতে

● ইসমাইল মাহমুদ

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ী চা বাগান কর্তৃপক্ষ একসাথে প্রায় সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি মূল্যবান প্রাচীন গাছ কেটে ফেলেছে। দুর্গম এলাকা থেকে কর্তনকৃত কিছু গাছ সরানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে হাতি। সুপরিচিত পর্যটনকেন্দ্র লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের পাশে অবস্থিত ফুলবাড়ী চা বাগানের চামল, জাম, শিরীষসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৩ হাজার ৬শ গাছ একবারে কেটে ফেলায় পাখির আবাসস্থল ধ্বংস ও পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে বলে পরিবেশবিদরা আশঙ্কা করছেন।

বিশাল ফুলবাড়ী চা বাগানে ছায়াবৃক্ষ হিসেবে রয়েছে পঞ্চাশ থেকে একশ বছরের চামল, জাম, শিরীষসহ মূল্যবান অনেক গাছ। মাগুরছড়ার পরিত্যক্ত গ্যাসকূপটিও ফুলবাড়ী চা বাগান এলাকায় অবস্থিত। ১৯৯৭ সালের জুন মাসে মাগুরছড়া গ্যাসকূপ বিস্ফোরণের প্রভাব, বন্যপ্রাণী, পাখির আবাসস্থল ও খাবার ছাড়াও চা গাছের ছায়াবৃক্ষ হিসেবে গাছগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ফুলবাড়ী চা বাগানের শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, গত জানুয়ারি মাসে চামল, জাম, শিরীষসহ পুরনো ৩ হাজার ৬শ গাছ ৪ কোটি টাকা মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে কোম্পানি এসব গাছ বিক্রি করেছে। পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের মৌলভীবাজার জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নূরুল মোহাইমিন মিল্টন বলেন, 'প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা প্রাচীন বিশাল গাছগুলো পাখিদের বিচরণক্ষেত্র। বিশেষত বিলুপ্তপ্রায় বাংলা শকুনের অবাধ বিচরণের জন্য গাছ-গাছালি খুবই প্রয়োজন। এই গাছগুলো কেটে ফেলার কারণে যে ক্ষতি হলো, তা কোনোভাবেই পুষিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।' বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা (লাউয়াছড়া) মো. মর্তুজা আলী বলেন, 'পশুপাখির বাসস্থান ও তাদের খাবারের জন্য প্রাচীন গাছগুলো খুবই প্রয়োজন। এক সঙ্গে এতগুলো গাছ কেটে ফেলা খুবই দুঃখজনক।'

ফুলবাড়ী চা বাগানের ব্যবস্থাপক মো. লুৎফুর রহমান ৩ হাজার ৬শ গাছ বিক্রির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'বয়স বেশি হয়ে যাওয়ায় গাছের ভালোর জন্যই বন বিভাগের অনুমতিক্রমে এগুলো বিক্রি করা হয়েছে।'

আরো স্বপ্ন দেখাচ্ছে তেঁতুলিয়ার চা বাগান

● আবু জাফর সাবু

দেশের সর্ব উত্তরে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় সীমান্তবর্তী সমতলভূমিতে গড়ে উঠেছে নয়নাভিরাম চা বাগান। দেশে অর্গানিক ও দার্জিলিং জাতের চায়ের চাষ হয় একমাত্র তেঁতুলিয়ার চা বাগানগুলোতেই। এই চা ইতিমধ্যে দেশের বাইরেও সুনাম কুড়িয়েছে। স্বপ্ন দেখাচ্ছে আরো অনেক অর্জনের। পঞ্চগড়ে চা চাষ হচ্ছে সমতলভূমিতে। এখানকার চা বাগানগুলোতে জৈব সার ব্যবহৃত হয়। সিলেটের মতো রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় না। আর পঞ্চগড়ের চা বাগানে ছায়াদানকারী গাছ হিসেবে লাগানো হয়েছে ঔষধি জাতের গাছ। ১৯৯৮ সালে দেশের এক প্রখ্যাত শিল্পপতি লে. কর্নেল (অব.) কাজী শাহেদ আহমেদ পঞ্চগড়ের কিছু জমি কিনে চা চাষ শুরু করেন। নামকরণ করেন 'কাজী অ্যান্ড কাজী টি এস্টেট'। তেঁতুলিয়া থেকে পঞ্চগড়ে যাওয়ার পথের ধারে হারাদীঘিতে এই কাজী অ্যান্ড কাজী টি এস্টেট অবস্থিত। একপাশে কাজী টি এস্টেট, অপর পাশে ভারতীয় সীমানায় ভারতীয়দের চা বাগান। প্রায় ৭শ গজ দূরেই কাঁটাতারের বেড়া। পঞ্চগড়ের সমতলভূমিতে ২০০০ সাল থেকে আগ্রহী চা চাষিরা ছোট-বড় অনেক চা বাগান গড়ে তুলেছেন। মাটির গুণের কারণে সিলেট কিংবা চট্টগ্রামের চেয়ে এখানে ভালোমানের চা উৎপাদিত হয়। ১৩ বছরে এখানে প্রায় ৩ হাজার একর জমিতে চা বাগান গড়ে উঠেছে এবং প্রায় ১০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পঞ্চগড়ের চা ২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে এবং ২০০৬ সাল থেকে স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয়ে আসছে।

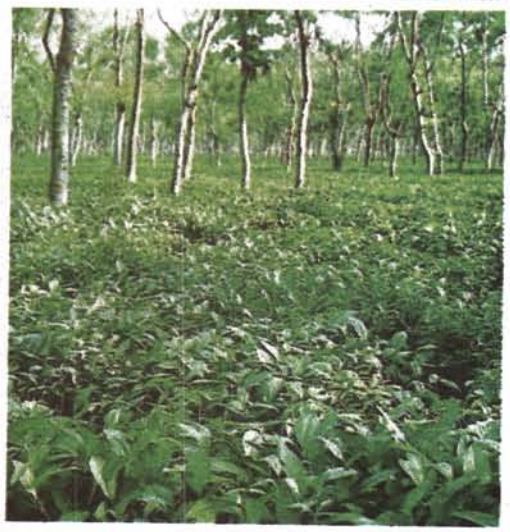

কীভাবে পাবেন বিষমুক্ত নিরাপদ আম

● আব্দুর রব নাহিদ

আপনি আপনার পরিবারের জন্য যে আম কিনছেন তা কতটা স্বাস্থসম্মত? বেশি দামের আশায় অপরিপক্ব আম পাকাতে, আকর্ষণীয় করতে এবং দ্রুতপচন রোধে আম ব্যবসায়ীরা এখন ব্যবহার করছেন জীবনঘাতী ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও ফরমালিনসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ। এসব আমের ভিড়ে ভালো আম খেতে চাইলে সতর্ক হয়ে আপনাকে আম কিনতে হবে। আপনি যদি বিভিন্ন জাতের আম কখন প্রাকৃতিকভাবে গাছে পাকে তা জেনে সেই সময়ে ওই জাতের আম কেনেন তবে অনেকটাই নিরাপদ আম পেতে পারেন।

এই বিষয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের আঞ্চলিক ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. শরফ উদ্দিন জানান, সাধারণত বারি আম-১ (মহানন্দা), বারি আম-৫, গোপালভোগ ও বৃন্দাবনি আম প্রাকৃতিকভাবে পাকে মে মাসের শেষ সপ্তাহ হতে জুন মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে। আবার বারি আম-২ (লক্ষ্মণভোগ), খিরসাপাতি, রানীপছন্দ ও হিমসাগর আম পাকে জুন মাসের দ্বিতীয় হতে চতুর্থ সপ্তাহে। ল্যাংড়া, বারি আম-৩ (আম্রপালি), বারি আম-৬ (বৌভুলানি) এবং বারি আম-৭ (আপেল আম) আমগুলো পাকে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। এছাড়াও ফজলি, বারি আম-৪, হাড়িভাঙ্গা এবং বারি আম-৮ পাকে জুলাই মাসের দ্বিতীয় হতে চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত এবং আশ্বিনা জাতটি পাকে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু আগাম বাজার ধরার জন্য এবং আমে আকর্ষণীয় রঙ আনার জন্য ব্যবসায়ীরা অপরিপক্ব আম পাকাতে কার্বাইড আর পচন ঠেকাতে

ফরমালিন ব্যবহার করছে। পাকা আম যেখানে বিক্রি করা হচ্ছে সেখানে একটু লক্ষ্য করে দেখবেন আমে মৌমাছি, মাছি বসে আছে কিনা। যদি দেখেন কোনো মাছি নেই তাহলে আপনি ধরেই নিতে পারেন এতে ফরমালিন দেয়া হয়েছে। গাছ পাকা আমের গায়ে খুব হালকা সাদাটে ভাব থাকে, যা আমচাষিদের কাছে পাউডার নামে পরিচিত, কিন্তু ফরমালিন বা অন্যান্য রাসায়নিক মেশানো হলে আমের এই পাউডার ধুয়ে যায়, ফলে আম দেখতে ঝকঝকে হয়ে ওঠে। আম ব্যবসায়ীরা ভালো দাম পেতে গাছে থাকা কাঁচা আমে বিভিন্ন রাইপেনিং হরমোন স্প্রে করে, আবার গাছ থেকে পেড়ে আম একসঙ্গে পাকাতে ব্যবহার করে ক্যালসিয়াম কার্বাইড। ফলে আম পাকার পর সব আমই একই রঙ ধারণ করে। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হরমোন ও কার্বাইড ব্যবহারের ফলে সব জাতের আমই কমবেশি রঙিন হয়। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে পাকা আমে জাতভেদে রঙের ভিন্নতা রয়েছে। গাছপাকা আম হলে অবশ্যই বোঁটার কাছে সুমিষ্ট ঘ্রাণ থাকবে। রাসায়নিক মেশানো আম হলে কোনো গন্ধ থাকবে না। আম কিনে কিছুক্ষণ রেখে দিন। গাছপাকা আম হলে গন্ধে ম-ম করবে চারপাশ।

ভোলায় বিলুপ্তির পথে দেশি পাখি

● ছোটন সাহা

এক সময়ে ভোলার মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, গাছে গাছে জাতীয় পাখি দোয়েলের দেখা মিললেও এখন আর একটা পাখিও চোখে পড়ে না। শুধু দোয়েল নয়, কয়েকজন বয়স্কের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ময়না, কোকিল, শালিক, চড়ুইসহ দেশি প্রজাতির বিভিন্ন পাখি এখানে এখন বিলুপ্তির পথে।

ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ মোজাম্মেল মিয়া বলেন, কয়েক বছর আগেও মানুষের ঘুম ভাঙত পাখির ডাকে। কিন্তু এখন গাছ-গাছালিতে পাখির কাকলি থেমে গেছে। অল্পসংখ্যক টিয়া, ঘুঘু, বক, কাক, মাছরাঙা শহর ও গ্রাম-গঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেলেও জাতীয় পাখি দোয়েল আর চোখে পড়ে না। পাখিপালক জাকির হোসেন বলেন, দোয়েলসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিলুপ্তির পথে। শিকারিরের দৌরাত্ম্যে পাখিশূন্য হয়ে পড়ছে বনাঞ্চল। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নজরুল হক বলেন, বন উজাড় করে গাছ কাটায় পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এতে পাখির বিচরণক্ষেত্র কমে যাচ্ছে। তাছাড়াও ফসলে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে কীটপতঙ্গ কমে যাওয়ায় পাখির খাদ্যসঙ্কট প্রকট হয়েছে। এতে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পাখি। এখনই পরিবেশ রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ না নিলে পাখি রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে। পরিবেশ রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে জাতীয় পাখি দোয়েলসহ দেশি প্রজাতির বিভিন্ন পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা।

ঋষিপল্লীতেই জুতা-স্যান্ডেলের কারখানা

● লিটন ঘোষ জয়

এক দশক আগেও মাগুরা শহরের ঋষিপল্লীর অধিবাসীদের মূল পেশা ছিল পুরনো জুতা-স্যান্ডেল সেলাই। এখন সেসব পরিবারের শতকরা ৮০ ভাগই নতুন জুতা-স্যান্ডেলের ছোট কারখানা গড়ে তুলেছে। সৃজনশীলতায় তারা বদলে ফেলেছেন অভাব-অনটনের কষ্টের দিন।

শহরের পিটিআই সড়কে প্রায় একশ পরিবার নিয়ে এ ঋষিপল্লী। এখানে এলেই এখন চোখে পড়বে ছোট ছোট টিনশেড ঘরে জুতা-স্যান্ডেল তৈরির বেশ কয়েকটি কারখানা। অধিকাংশ পরিবারই তাদের বাসগৃহের সামনের দিকটায় গড়ে তুলেছে এসব কারখানা। যেখানে সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইনে তৈরি হচ্ছে নানা বয়সী নারী-পুরুষের জুতা-স্যান্ডেল। প্রতিমাসে ৪০ থেকে ৫০ হাজার জোড়া জুতা-স্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে এই পল্লীতে, যা মাগুরাসহ বিভিন্ন জেলায় খুচরা ও পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে। ডিজাইন, স্থায়িত্ব ও মূল্যের দিক দিয়ে সুবিধাজনক হওয়ায় দিনকে দিন এখানকার জুতার চাহিদা বাড়ছে। এ ছাড়া এসব কারখানা স্থাপনের ফলে ২০০ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এক ডজন স্যান্ডেল তৈরি করে কারখানায় কর্মরত একজন কারিগর ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা মজুরি পান। একজন কারিগর প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ জোড়া স্যান্ডেল তৈরি করতে পারেন। ঋষিপল্লীর জুতা ব্যবসায়ী স্বপন কুমার দাস জানান, বর্তমানে কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় এ ব্যবসায় টিকে থাকতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই বড় বড় কোম্পানি থেকে এক সঙ্গে অনেক মালের অর্ডার আসে। সে ক্ষেত্রে তারা পুঁজি সঙ্কটে পড়েন। জরুরি প্রয়োজনে চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে অনেকেই বিপাকে পড়েছেন। এমনকি এই চড়া সুদের ফাঁদে পড়ে অন্তত ২০টি কারখানা বন্ধও হয়ে গেছে। এ কারণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি এ শিল্পকে বাঁচানোর জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেয়া প্রয়োজন।